

রৌদ্রবেলা ও বরাফুল

মাসুদ আহমেদ

১৯৭১-এর একটি অধ্যায় এই উপন্যাসে বর্ণে বর্ণে রচিত হয়েছে। মানব সভ্যতার বিরোধী পাকিস্তান বাহিনী বাংলাদেশে তাদের দুর্বৃত্ত্যের ফসল দুই লাখ যুদ্ধশিক্তকে পরিত্যাগ করে যায়। লোকলজ্জার ভয়ে জননীরাও এই শিক্তদের ত্যাগ করে আহাঙ্গোপন করেন। রেডক্রসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এমনি একটি শিশু পেনরোজকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন পাকিস্তানে কর্মরত সুইডিশ দম্পতি স্ট্রাইস এবং এলেনা ওডারমান। তাকে তারা নিজ সন্তানের মতো লালন-পালন করেন। তার বিয়ের সময় উপস্থিত হলে কঠিন সভ্য প্রকাশ করতে তারা বাধ্য হন। আত্মপরিচয়ের এই তীব্র সংকটের সময় প্রচণ্ড মানসিক ধ্বসে অবসাদগ্রস্ত পেনরোজের পাশে এই দম্পতি ছাড়াও আরও দাঁড়ায় তার ফিয়ানি প্রোসারপিনা।

ওদিকে পেনরোজের গর্ভধারিণী দেলজুয়ারা বেগম পরিণত বয়সে বুঝতে পারেন যে তাঁর অল্প বয়সের এই সিদ্ধান্তটি জীবনের গভীরতম মর্মবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পেনরোজ বেগম হয়ে পড়ে শিকড়ের সন্ধান। এই সূত্রে তার জীবনের সমস্ত সুখের হস্তারক ১৯৭১ সালের ৪০নং ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির সুবেদার মালিক তাসকিন উদ্দিন খানকে একনজর দেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে পেনরোজের মনে। পেনরোজ ও প্রোসারপিনা পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশের যশোরে দেলজুয়ারার হোজে আসে। পুরুষকে দেখার অদম্য কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও দেলজুয়ারা এখন কী করবেন?

১৯৭১-এর রণভংকা, পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ ও সৈন্যদের নির্ভরতা, মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ইত্যাদির পর সসংকোচ, সলজ্জ, প্রচণ্ডবিমূখ এবং 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' সববিশ্ব বহনকারী নিরপরাধ এক সন্তান ও জননীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ আলোখা ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। দেশি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন হওয়া এবং তার পাশাপাশি ১৯৩ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচারের দাবি ক্রমশ উচ্চারিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে মাসুদ আহমেদের এই বই জোরালো প্রাসঙ্গিকতা পাবে।

‘কারো কবিতু, কারো বীরতু
কারো অর্থের খ্যাতি,
কেহবা প্রজার সুহৃদ সহায়
কেহবা রাজার অতি।
তুমি আপনার বন্ধু জনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।’

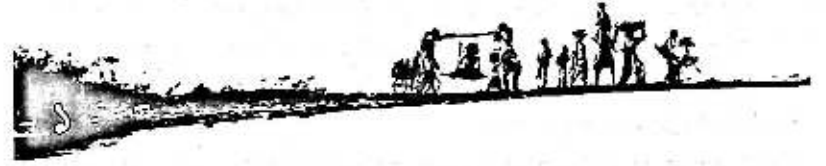
আমার যত দেনা

এটি আমার চব্বিশতম সাহিত্য সৃষ্টি প্রচেষ্টা।

রাজনীতি, গোষ্ঠীস্বার্থ, রণশঙ্কা, রণডংকা, পারস্পরিক হনন, বিজয়ীর উল্লাস, বিজিতের পরাভব-এর বিবর্তনের মধ্যদিয়ে বিশ্ব সীমানা ও স্বার্থের নতুন নতুন বিন্যাস ঘটে। অসন্ত্রম, অগ্নিসংযোগ, ধ্বংস আর নিহত স্বজনের স্মৃতি পেছনে ফেলে মানুষ আবার উঠে দাঁড়ায়, নতুন সৃষ্টি ও নবজীবনের আলোক সম্ভাবনায়। তারপর এইসব কুশীলবকে নিয়ে আলোচনা করতে থাকে ইতিহাস। এর শিল্পরূপ নিয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে সাহিত্য, সংগীত এবং চিত্রকলা। তাতে স্থান পায় রাজনীতিবিদ, সেনাপতি, সৈন্য, সাধারণ মানুষ, আমলা, ‘লাঙল কাঁধে কৃষক’, ছাত্র, শ্রমিক এবং আরও নানা শ্রেণির মানুষ। কিন্তু সেখানে অপাড়ভের হয়ে থাকে একদল নিরপরাধ ‘অপরাধী’ মানুষ। অথচ ত’রা নিষ্পাপ। যুদ্ধের ফল—যুদ্ধশিশু। যুদ্ধোত্তর ইউরোপেও বড় করে এই সংকট দেখা দিয়েছিল। সসংকোচ, সলজ্জ, আত্মনিমগ্ন, গন্তব্যহীন, গোত্র-পরিচয়হীন এদের জীবন ও জীবিকা নিবিড় ভূমিস্রোতে ঢেকে রাখে সমাজ। ১৯৭১-এ উদ্ভূত বাংলাদেশের এই জনগোষ্ঠী নিয়ে আলোচনা প্রায় হয় নি বললেই চলে। এই উপন্যাসে দেলজুয়ারা বেগম, পেনরোজ ও ওডারম্যান দম্পতির মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এই মানবিক অধ্যায়কে উন্মোচন করবার চেষ্টা করেছি। তবে তা নিশ্চয় পেরেছি কি না তা পাঠকেরাই বলবেন।

কাহিনির নির্মাণ ও প্রকাশ করার কাজে আন্তরিক সহযোগিতা করার জন্য রিফাত রেজা, ড. সৈয়দা আইরিন জামান, কানাডা প্রবাসী মোস্তফা চৌধুরী, কবি সাহাদ চৌধুরী, নাসির মাহমুদ, মাজহারুল ইসলাম, শাহরিয়ার পিউ, তোফাজ্জল নেয়ামত, খুরশীদ আলম পাটওয়ারী, রেজাউল ইসলাম, গোলাম মুস্তাফা এবং দেশ পত্রিকাকে আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার পাঠক (বই কিনে বা ধার করে), সমালোচক (কিনেন নি তবে পড়েছেন), ক্রেতা (কিনেছেন কিন্তু পড়ার সময় পান নি) ও সমর্থক (কিনেছেন, পড়েছেন এবং পাশে দাঁড়িয়েছেন) বৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। তারাই আমার এই উজ্জান গাঙের নৌকাখানিকে টেনে চলছেন। এই অধিবাসের অন্যতম বাতিঘর, বিপ্লবতার পরম সাধক, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, পদ্মশ্রী, আমার এই উপন্যাসের মুখবন্ধ লিখে দিয়ে আমাকে অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে নিবদ্ধ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিলে খুব সামান্য কাজ হয়। অসামান্য কিছু বলব সেই সামর্থ্য আমার নেই। অতএব তিনি বুঝে নেবেন।

মাসুদ আহমেদ
৩ নং মিন্টো রোড, ঢাকা



কবি তব মনভূমি

উনিশ শ' সাতানব্বইয়ের জানুয়ারির সকাল। নাইলনের পর্দা আর কাচের শাশী ভেদ করে বাইরের তুষারঝড়ের মাতামাতি দেখা যাচ্ছে। ব্যারোমিটারে টেম্পারেচার যা-ই দেখাক বাইরে আসলে চলছে মাইনাস পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্টকহোম শহর হলেও এই বাড়িটা পড়ছে ডালারনা কাউন্টিতে। এলাকাটা শহরের একেবারে উত্তরপ্রান্তে। বাথরুমের দরজা খোলা রেখে স্ট্রাউস ওডারম্যান শেভ করছিলেন। বাঁ গালের কাজ শেষ হয়েছে। এবার ডান গালে রেজর ছোঁয়াবেন। আজ রোববার হলেও একটু পর একটা কাজে বাইরে বের হবেন তিনি। কাল বেশ রাত করে বাসায় ফিরেছিলেন। গাড়িটা বাইরেই রেখেছিলেন। গ্যারেজের দরজায় গতকালই কী একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। মিস্ত্রি পাওয়া যায় নি। এর মধ্যে গাড়িতে বেশ বরফ জমেছে। ওগুলো পরিস্কার করতে হবে। ওডারম্যানের মাথায় এই চিন্তাটা চলছিল।

এ দেশে যন্ত্রপাতি নষ্ট প্রায় হয়ই না। আর কদাচিৎ হলেও তা মেরামত করতে মিস্ত্রি পেতে সময় লাগে না। তাই গতকালের ব্যাপারটা ছিল ব্যতিক্রম। কিচেনে ব্রেকফাস্ট তৈরি করা শেষ হয়ে গেছে। স্বামীর বাথরুম ব্যবহারের হালকা শব্দ এলেনার কানে যাচ্ছিল। টেবিল সাজানোর আগে তিনি বাথরুমের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। ওডারম্যান আয়নায় স্ত্রীর ছবি দেখতে পেয়েছেন। তাঁর গুখ কতনের কাজও শেষ। তিনি হাসিমুখে বললেন, কিছু বলবে? তোমাকে দেখে বিজ্ঞাপনের সেই মডেল মেয়েটির কথা মনে পড়ছে আমার।

কোন মেয়েটির কথা?

ওই যে শেভিং ফোমের বিজ্ঞাপনের মেয়েটি, পেছন থেকে এসে ছেলেটিকে বলে, তোমার শেভ করা খুব ভালো হয়েছে। কারণ ব্রান্ডটি যে...।

ভালোই বলেছো। রস আছে তোমার এখনো।

বুড়ো তো আর হয়ে যাই নি। এখনো মানে কী? রস ছাড়া বেঁচে আছি কী করে বলো? তা ছাড়া পঁয়ষাট আর এমন কীই-বা বয়স? আমাদের গড় আয়ু যেখানে নব্বই।

সাবান আর ফোমের মিষ্টি গন্ধে বাথরুমটা এখন ভরপুর। এলেনা আরেকটু ভেতরে ঢুকলেন। ওডারম্যান বললেন, কিছু বলবে মনে হচ্ছে।

বলছিলাম আমাদের বয়স হয়েছে। ছেলেটাও বড় হয়েছে।

জীবন কথায় ওডারম্যানের মুখের হাসি হাসি ভাবটা মিলিয়ে গেল। তিনি মুখ-হাত ধুয়ে ভোয়ালে দিয়ে মুছলেন। গালে আফটার শেভ মাখলেন। তারপর বললেন, হুঁ, তোমার কথাটা কী?

তুমি আমি সামান্য অন্যায় বা বেআইনি কিছু করি নি। তবুও আমার মনে হয় ওকে কথাটা বলা উচিত।

আমি অনুমান করেছিলাম কথাটা এই-ই হবে। তবে আজকের এমন গুত দিনেই বলব?

তার বিশেষ রকম কারণ আছে।

কী সেটি?

জেনিছি ওর ফিয়ান্সি ঠিক বিয়ের কথা না বললেও ফ্যামিলি গঠন করার একটা কিছু ভাবছে। কাজেই কথাটা এখন বলা প্রাসঙ্গিক হবে।

আচ্ছা আজকে ওর জন্মদিনের পার্টিটা শেষ করি? তারপর কথাটা বলি?

ঠিক আছে।

ও এখন কী করছে?

রুমে আছে। নাশতা খাবে বলে অপেক্ষা করছে।

মনে পড়ে ওকে নিয়ে যেদিন এ বাসায় ঢুকি কীরকম শীত পড়েছিল? একেবারে ইউরোপের রেকর্ড শীত।

মনে আবার পড়বে না? এত হিটিং, এত সব বিশেষ ব্যবস্থা। তারপরও আমার ভয় হচ্ছিল ভালো একটা অসুখে ধরে কি না।

হ্যাঁ, সারা প্রেনেই তো কাশছিল। এত লম্বা জার্নি। তার মধ্যে যেখান থেকে আমরা রওনা দিয়েছিলাম সেখানেও শীত ছিল ভালোরকম।

কী যে বলো, ও শীত তো এখানকার তুলনায় কিছুই না। তবে দশ দিনের শিত্তর জন্য অবশ্য ওটা ঝুঁকিপূর্ণই ছিল।

এরপর যিভর দরায় দেখো কত বছর পার হয়ে গেল। আমাদের বাচ্চার অসুখবিসুখ তেমন একটা হয় নি কিন্তু—তাই না?

হ্যাঁ। ওর ভেতরের স্বাস্থ্যটাও বেশ ভালো। ব্যাপারটা আমি কখন বুঝেছি জানো?

কখন?

পাস করার এক বছরেও ও যখন চাকরি পেল না তখন দেখেছি কীভাবে যে লড়ছে ভালো একটা জবের জন্য। আমি একদিন শেষে বললাম, তুমি এত

ফ্র্যানটিক হয়েছে কেন চাকরির জন্য? তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান এবং আমাদের যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে। এ সবই তোমার। ও তখন বলল, বাবা, এ দেশে কোনো ছেলেমেয়ে বাবা-মার টাকাপয়সা দিয়ে চলে না। আমিও চলব না। এবং আমি বলব রিলেটিভলি কম সময়ে সে চমৎকার পোকেশনে নিজেকে এস্টাবলিশ করতে পেরেছে।

হ্যাঁ, এরকম ছেলে বা মেয়ে এক্সপেশনাল।

ওর জীবনটাও তো এক্সপেশনাল। এমন মানুষ আমরা কয়টা দেখেছি জীবনে?

কে-ই বা দেখেছে বলতে পারো?

থাক ওসব আর মনে কোরো না। দেখব কী করে? এমন মানুষদের কথা শোনা যায় হয়তো, কোথাও সত্যি সত্যি দেখা পাওয়া তো একটা দুর্লভ ব্যাপার। যিওই আমাদের সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাই না?

আমি বরাবর তা-ই বিশ্বাস করে এসেছি।

আচ্ছা যাক এসব কথা। আসলে ওর জন্মবার্ষিকী এলে এসব কথা মনে পড়ে যায়। এখন নাশতা খেতে চলো।

কিছুক্ষণ পর ওডারম্যান নিচে নামেন। বাড়ির সামনে যে বাগান, দরজা খুলে সেখানে যান। পাড়িটা সাদা হয়ে রয়েছে। তুষারে ঢাকা যন্ত্রটাকে বোঝাই যাচ্ছে না জিনিসটা কী। তিনি একটা বেগুলা হাতে তুষার সরানোর কাজে হাত দেন। আধা মিনিটের মধ্যে তিনি বুঝতে পারেন কেউ-একজন তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আচ্ছা বাবা, আমাকে ডাকো নি কেন?

ভাবলাম বন্ধের দিন। রেস্ট করবে। রাতেও কাজ আছে অনেক।

ছেলের হাতেও একখানা প্লাস্টিকের তৈরি শাবল। সে ক্ষিপ্ত হাতে পাড়ির বরফ পরিষ্কার করার কাজে হাত লাগায়। ওডারম্যানের ভেতরে ভেতরে খুব ভালো লাগতে থাকে।

এলেনা এর মধ্যে খোলা বেলকনিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই আবহাওয়ায় এ দেশে কেউ বেলকনিতে দাঁড়ায় না। তবে জন্ম হওয়ার পর এলেনাও বরফের গর্তে বরফ নিয়ে খেলে বড় হয়েছেন। তিনি নিচে তাকিয়ে পিতা-পুত্রের কাজের দৃশ্য দেখতে থাকেন। তার খুব ভালো লাগতে থাকে। এ দেশে এ দৃশ্য বিরল। কিন্তু তাদের পুত্রটি অন্যরকম। তাঁর আরও অনেক কিছুই তার বৈশিষ্ট্যের মতো। এলেনার তখন মনে হয়, তাই তো। এর কারণ রয়েছে, যেভাবেই একে মানুষ করে থাকি না কেন!

পাড়ি এখন ঝকঝকে। নীল রঙের চকচকে ডলতো সেডানটিকে আর মনে হচ্ছে না একটু আগেও এটা যে বড়দিনের সান্ত্বনাজের মতো সাদা পোশাকে

ওডারম্যান সিগারেটের ছাই ডানদিকের অ্যাশট্রেতে ফেললেন। মাথার ওপর থেকে একটা বালের রূপালি আলো তাঁর টাকমাথা, সোনালি রিমের চশমার কাচ ও ফর্সা মুখের ওপর এসে পড়েছে। তাঁর খাড়া নাক, পিঙ্গল চোখ, গলাবন্ধ করা ফুলহাতা সোয়েটার, আলো এবং চিত্তিত মুখ মিলে তাঁকে অনেকটা ধ্যানমগ্ন একজন গীর্জার যাজকের মতো দেখাচ্ছে। এবার তিনি সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে নিভিয়ে ফেললেন। স্ত্রী তাঁর বাঁ পাশে বসেছেন। সকালের আবহাওয়া বদলায় নি। ঝড়ো বাতাস বইছে। তবে ঠান্ডা বেড়েছে। বাইরে স্টকহোম মহাসড়কে দু-একটা গাড়ির শব্দ মাঝেমধ্যে ভেসে আসছে। পেনরোজ ভাবতে থাকল, কী বলবেন তার বাবা!

তিনি কিছু বলছেন না।

পেনরোজ বলল, বাবা, কী হয়েছে তোমার? তোমাকে মোটেও অন্যান্য দিনের মতো লাগছে না। তুমি তো জীবনে প্রতিটি কাজেই সফল হয়েছ। তোমার লেখা ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়ানো হয়। এই রিটার করার পরও শুধু একটা লেকচার দেওয়ার জন্য তোমাকে আমেরিকাতে পর্যন্ত ইনভাইট করে। কোনোদিন তোমাকে কোনো বিষয়ে চিত্তিত হতে দেখলাম না। সেই তোমার আজ কী হলো বলো তো? তার মধ্যে আজ আমার শুভ জন্মবার্ষিকী।

আমার কিছু হয় নি। আমরা ইউরোপিয়ান। অতীত নিয়ে ভাবা বা হতাশ হওয়া আমাদের স্বভাব নয়। তারপরও ভাবছি, যে কথাটা বলতে চাচ্ছি এবং যা বলা দরকার, তা গুনলে তোমার মনটা কেমন হবে? আমি তা নিয়েই চিত্তিত।

ভেবো না। আমি জানি না কী বলতে চাও। বলছ ওটা বলা দরকার। তোমাদের সন্তান হিসেবে আমিও কম টাফ নই। বলে ফেলো তোমার কথা বাবা।

হ্যাঁ, বলতে আমাকে হবেই। জানো, তোমার প্রশংসা তোমার সামনেই করছি। এই যে তুমি আঠারো বছর পার করেছ সাত বছর আগে, তুমি খুব সহজেই আমাদের ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে পারতে। এই সমাজে শতকরা নব্বই ভাগ ছেলেমেয়ে তা-ই করছে। অথচ তুমি তা করো নি। কথাটা তোলও নি। তারপর তুমি পড়াশোনা শেষ করে ভালো জব করছ তাও চার বছর হয়ে গেল। গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে বা বিয়ে করে আলাদা বাসা করে থাকতে পারতে। তোমাকে কথাটা আমরা বলেছিও। তবু তুমি তা করো নি। এই সংস্কৃতি শুধু আমাদের এই সুইডেনে নয়, সারা ইউরোপেও বিরল এবং প্রশংসনীয়। প্রোফেশনে, এই বয়সেই তোমার সুনাম ঈর্ষনীয়।

এই পর্যন্ত বলে ওডারম্যান তাঁর বাইফোকাল চশমার ওপর দিয়ে সামনের দেয়ালের দিকে তাকান। সেখানে অনেকগুলো বাঁধানো ফটোমাফ। পেনরোজের নানা বয়সের ছবি তাতে—কোনোটা ছ'মাসের হামাগুড়ি দেওয়া, কোনোটা মায়ের কোলে এক বছরের, কোনোটা বাবা-মার মাঝখানে স্কুলের ইউনিফর্ম পরনে। কোনোটা আবার ইউনিভার্সিটির কনভোকেশনে ফ্লাইং কালার আর গাউন পরনে।

ওডারম্যান আবার আরম্ভ করেন।

বাবা, সবকিছু বোবার বয়স তোমার হয়েছে। বলছিলাম, এই সংস্কৃতি শুধু আমাদের এই সুইডেনে নয়—এগুলো ইউরোপে বিরল এবং প্রশংসনীয়। তারপরও বলছি, এই যে ফটোমাফগুলি দেখছ, দেখে এসেছ এত দিন ধরে, সেগুলো ঠিক মিথ্যে নয়, তবে সত্যিও নয়।

সে আবার কেমন কথা বাবা? তুমি ঠিক কী বলতে চাচ্ছ পরিষ্কার করে বলো তো।

বলছি ফটোগুলো সাজানো। সেই যে ইন্ডিয়ান কবি ট্যাগোর বলেছিলেন না—‘আমি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তোমারে করেছি রচনা’। এ অনেকটা সেরকম।

পেনরোজ পেশায় একজন সোশোলজিস্ট। আর ওডারম্যান হিমবাহ বিশেষজ্ঞ। বাবার কথাগুলো ও বুঝতে পারে না। বলে, বাবা, তোমার কথাগুলো আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার নয়।

এলেনা এসময় তাঁর ডান হাত দিয়ে স্বামীর বাঁ হাতখানা ধরেন। তিনি স্বামীকে বলেন, এত ঘোরপ্যাঁচ বাদ দিয়ে তুমি এবার কথাটা বলে ফেলো তো।

ওডারম্যান এতক্ষণে মনস্থির করতে পেরেছেন। তাঁর চোখে চশমার আড়ালে মুঞ্জাবিন্দুর মতো অশ্রুধারা। তাঁর সামনে ছোট্ট টেবিলের ওপর দামি চামড়ায় বাঁধানো একখানি বাইবেল। তিনি ওটার ওপর তাঁর ডানহাত রাখেন। এবার তিনি পেনরোজের দিকে সরাসরি তাকান। তারপর বলতে শুরু করেন।

তোমার জন্মের দিন থেকেই এই তোমার মা আর আমি তোমাকে এতটা বড় করে তুলেছি। পরম মমতা, যত্নে এবং স্নেহে কোনো কমতি করি নি। তুমিও আমাদের অফুরান ভালোবাসা দিয়েছ যা অনন্যসাধারণ।

তিনি থামে বলে ফেলতে যাচ্ছিলেন, তোমার এই আচরণ ইউরোপীয় নয়...। কিন্তু তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। তারপর আবার বলা শুরু করলেন, তারপরও জীবনে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে পারে। থাকতে পারে যেগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের একেবারে বাইরে। শুনেছ না ‘ট্রুথ ইজ স্ট্রেনজার দ্যান ফিকশন’ কথাটা? কিংবা শেকসপীয়ার-এর সেই অমোঘ উক্তি—‘দেয়ার আর মোর থিংগস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ দ্যান আর ড্রেমট অব ইন ইউর ফিলোসোফি, হোরশিও’। এখন তোমাকে যে কথাটা বলব তা খুব শক্ত মনে হতে পারে। তবুও তা সত্যি—তা হলো এই যে তুমি এতদিন ধরে যা সত্য বলে জেনে এসেছ তা সত্যি নয়। তুমি আমাদের সবকিছু, কিন্তু তারপরও তুমি আমাদের সন্তান নও।

ওডারম্যান থামলেন। পেনরোজ কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে। মাথা নিচু করে কপালে হাত দিয়ে ও বসে আছে। ওর মনে হলো ভয়ংকর এক সমুদ্রঝড়ে একটা জাহাজডুবি হচ্ছে। সেইসঙ্গে দুলছে সারা পৃথিবী। আর তাতে ও এক সাঁতার না জানা যাত্রী। ঝরঝর করে না হলেও ওর চোখ আস্তে আস্তে ভিজে উঠছে। প্রচণ্ড



বারিধির অনেক ওপরে

১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসের কথা। তখন আমার পড়াশোনা শেষ করার পর পনেরো বছর পার হয়েছে। নানারকম চাকরি করি আর ছাড়ি। কারণ মনমতো কোনোটাই হয় না। তখন আমি সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরের বাইরে একটা ট্যুরিস্ট ক্যাম্পের প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছি। হঠাৎ একদিন একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ইন্টারভিউ কার্ড পেলাম। বিজ্ঞপ্তি দেখে আবেদন জমা দেওয়া ছিল আমার হবি। তো ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রমেন্ট অর্গানাইজেশন আমায় ডাকল ভাইবার জন্য। মর্যাদা ও বেতন মিলিয়ে পদটা ছিল একেবারে লোভনীয়। এবং বোর্ডে বসেই আমি বুঝতে পারলাম অফারটা আসবে। তা-ই হলো। পোস্টিং হলো পাকিস্তানে। ওই যে দেয়ালে ম্যাপ। ইন্ডিয়া পাশে। দেখো, একেবারে উত্তর-পূর্বে। বাতাসের গতি, বরফ, তুষারের চলাচল আর মেজাজ মজি দেখে রেকর্ড করে সেগুলো রিপোর্ট করাই আমার কাজ। আবহাওয়া বিভাগ এইসব তথ্য পাকিস্তান সরকারকে দিত। ওইসবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী ওই এলাকায় তাদের সৈন্যদের চলাচলের বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত নিত।

আমাদের বিয়ের বয়স তখন দশ বছর। জায়গাটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ফুট ওপরে। এলেনা অত উঁচুতে থাকতে ভয় পেত। বিশেষ করে শীতকালে। তবে এপ্রিল থেকে নভেম্বর সে ওখানে আমার সঙ্গেই থাকত। বাকি সময় এখানে ওর বাবার বাড়িতে। দিন আমাদের ভালোই কাটছিল। ডিসেম্বর মাসে ওই দেশটিতে অনেক দিন পর জাতীয় নির্বাচনের ডামাডোল বেজে উঠল। এতদিন দেশটা মিলিটারিরা শাসন করছিল। এই উপলক্ষে এমনকি আমার ডিউটি স্টেশনের কাছেও একটা ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হলো। বারো বছর পর নির্বাচন। সারা দেশে সে কী আনন্দ আর উত্তেজনা! এই ঠান্ডার মধ্যেও মাথায় পাগড়ি আর হাতে গ্ল্যাকার্ড, ফেস্ফুন ও ঢোল নিয়ে প্রার্থী, ভোটার আর দলীয় কর্মীদের সে কী মিছিল, বক্তৃতা এবং প্রচারণা। তবে আমরা বিদেশি হওয়াতে এই ঘটনার আসল অংশটা তখনো জানতাম না। তা ছাড়া পেপার বা অন্যান্য মিডিয়া আমার ওখানটায় তেমন একটা আসত না। আসল ঘটনা ঘটছিল দেশটার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটিতে। ওটার নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। ওটা আমাদের ওখান থেকে এক হাজার মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত

ছিল এবং এর মাঝখানের এই এক হাজার মাইল ছিল ইন্ডিয়ার অংশ। পূর্বাঞ্চলে আমার একবারও যাওয়া হয় নি। কারণ ওখানে বরফ, হিমবাহ, এমনকি ঝড় কিংবা তীব্র শীতের আবহাওয়া তেমন একটা ছিল না। তবে সেই ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ কলোনি থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার মাত্র কয়েক বছর পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানিরা মনে করা শুরু করে যে পশ্চিমারা ওদের ঠকাচ্ছে। এর নানারকম কারণও ছিল। সত্তরের নির্বাচনের সময়ই নানা প্রচার-পুস্তিকা, লিফলেট এবং বিশেষ করে বিদেশি পত্রপত্রিকা যা কিনা আমাদের অফিসেও আসত—সেগুলো থেকে আমি এই বিষয়টা কিছুটা জানতে ও বুঝতে পারি। এই ইলেকশনের ফলাফলই একসময় মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে ওই এলাকার কোটি কোটি মানুষের জীবনে। ব্যাপারটা হলো এরকম—পূর্ব পাকিস্তানিরা জনসংখ্যার শতকরা ছাপান্ন ভাগ এবং সরকারের খরচের শতকরা সত্তর ভাগ জোগাত। কিন্তু দেশটির রাজধানী হলো পশ্চিমাঞ্চলে। সেইসঙ্গে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর হেডকোয়ার্টার সব পশ্চিমে। সশস্ত্র বাহিনীসহ সব ধরনের চাকরিতে পূর্ব পাকিস্তানি মানে যারা বাঙালি হিসেবে পরিচিত ছিল, তারা কোনোভাবেই শতকরা দশ ভাগের বেশি সুযোগ পেত না।

অনেক আগে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে তাদের ভোটে একটি নির্বাচিত সরকারও হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমের কেন্দ্রের নানা ষড়যন্ত্রে সেই সরকার বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারে নি। কুশাসনের অজুহাত তুলে পশ্চিমের মিলিটারিরা শাসনতন্ত্র বাতিল করে ১৯৫৮-তে ক্ষমতা দখল করে। এতে তাদের শোষণ-নির্যাতন আরও বেড়ে যায়। বাঙালিরা এমনকি তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাটুকুও হারিয়ে ফেলে। ওদিকে তাদের আয় করা টাকায় পশ্চিম পাকিস্তান সমৃদ্ধ হতে থাকে। তখন রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। কিন্তু পশ্চিমের সামরিক নেতা ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান কঠিন হাতে শাসন চালিয়ে যেতে থাকেন। পশ্চিমের সব মানুষ যে এই অন্যায়ের সমর্থন করত তা নয়। তাদের মধ্যেও সচেতন লোক ছিল। তাই এই সামরিক একনায়কত্বের বিরুদ্ধে তারাও বাঙালিদের সঙ্গে যোগ দিলে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু এর মধ্যেও তার সরকার প্রায় এগারো বছর শাসন চালিয়ে গেছে। ফলে এতদিন পর দেশের সাধারণ নির্বাচনে বাঙালিরা পশ্চিমাদের হাতে তাদের শাসন-শোষণের অভিযোগগুলো ভোটারদের কাছে নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমে তুলে ধরায় মনোযোগী হয়।

বাঙালি নেতাদের কথা ছিল এই। সংখ্যাগুরু ওপর সংখ্যালঘিষ্ঠদের এতদিনের এই জুলুম বন্ধ করার পথ একটাই। তা হলো—এককাটা হয়ে বাঙালি প্রার্থীদের পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া। এটি যুক্তিসংগতও ছিল। বাঙালি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘদিন পশ্চিমাদের হাতে জেলখাটার কারণে এই দাবিগুলো ভোটারদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হন। বিশেষ করে আইয়ুব খানের পতনের পর বাঙালিদের জন্য আরেকটি সুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।

পেনরোজ জিজ্ঞেস করল, তুমি এতক্ষণ যা বললে তার কিছু কিছু আর্-ও ইতিহাসে পড়েছি এবং বুঝেছি। কিন্তু বাঙালিদের যেখানে ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা, সেখানে উল্টো তাদের ওপর প্রেসিডেন্টের গণহত্যার আদেশ দেওয়ার কারণটা ঠিক কী তা বুঝলাম না।

হ্যাঁ, এটিই হচ্ছে আসল ঘটনা। ব্যাপার হচ্ছে আমরা তো একটি অত্যন্ত শান্ত দেশে বসবাস করি। এখানে কোনো ডিপার্টমেন্ট বা সরকারের বিরুদ্ধে যদি কারও কোনো কিছু বলার থাকে তা হলে সেটির জন্যে খুব বেশি হলে পঞ্চাশজন মানুষ দশটি প্র্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাজপথের একটি নির্ধারিত অংশে পুলিশ পাহারায় হয়তো কয়েকটি শ্লোগান দিবে। তুমি বোধহয় তা দেখেছ। তোমার ইউনিভার্সিটি কিংবা কোনো মন্ত্রণালয়ের সামনে কর্তৃপক্ষের টনক নড়বার জন্যে এ-ই যথেষ্ট। কিন্তু ভারত, পাকিস্তান, কিংবা এশিয়া ও আফ্রিকার অবস্থাটা তা নয়। সেখানে কোনো দাবি-দাওয়া শুধু প্রকাশ করার জন্যে হাজার হাজার মানুষ মুহূর্তে রাস্তায় নেমে এসে ব্যাপক সহিংসতা, সম্পদহানি, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের কাজে লিপ্ত হয়। কর্তৃপক্ষও এগুলোর মোকাবিলায় প্রচণ্ড বলপ্রয়োগ করে। তো কাজেই তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, ক্রুদ্ধ বাঙালিরা পার্লামেন্টের অধিবেশন হুগিত করার প্রতিবাদে পহেলা মার্চেই রাস্তায় নেমে এসেছিল। পশ্চিমাদের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পেরে একান্ত বাধ্য হয়ে পাকিস্তান এবং পাকিস্তানি মিলিটারিবিরোধী শ্লোগানও দিয়েছিল। ওই পরিস্থিতিতে এটা ছিল একান্ত স্বাভাবিক এবং তারপর আলোচনার পেছনে পেছনে সৈন্য আমদানি দেখে বাঙালিরা বুঝতে পেরেছিল যে, আর যা-ই হোক তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে সংক্ষুব্ধ লাখ লাখ মানুষ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা না ভেবে পারে নি। তখন তারা পাকিস্তানের সংহতিবিরোধী শ্লোগান, জাতির পিতার প্রতিকৃতি এবং পাকিস্তানের পতাকা পোড়ানোর মতো কাণ্ডগুলোও করছিল।

পশ্চিমা, বিশেষত পাঞ্জাবি সৈন্যরা এই অবস্থা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা শুধু প্রেসিডেন্টের নির্দেশের অপেক্ষা করছিল। অথচ দেখো, যে কারণে বাঙালিদের এই ক্ষোভ অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তর না করা, সেটি সমাধানের বদলে অনেক স্বৈরাচারী শাসকের মতোই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও তাঁর অনুসারীরা ভেবেছিলেন যে, বলপ্রয়োগ করে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে। অর্থাৎ বাঙালিদের উশৃঙ্খলা দমন করলে সবকিছু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। অথচ বাঙালিরা তখন যে আসলে পশ্চিমের এই ঘোরতর অন্যায় দেখে মনে মনে স্বাধীনতাকেই একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে তা অনুধাবন করার মতো কোনো সুস্থ ব্যক্তি ক্ষমতার বলয়ে ছিলেন না। অতএব ২৫ মার্চ থেকে পশ্চিমা সৈন্যরা নির্বিচারে পাকিস্তানবিরোধী সন্দেহে বাঙালি সৈন্য, পুলিশ, রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী,

আমলা তথা যে-কোনো পেশার মানুষের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যেতে থাকল। লক্ষ্য—তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার স্পৃহাকে চিরতরে নির্মূল করা এবং পশ্চিমের আধিপত্যকে অব্যাহত রাখা।

পেনরোজ বলে, বাবা উনিশ শ' একাত্তরের বিষয়টি আমার কোনো কোনো পাকিস্তানি সহপাঠীর কাছ থেকে কিছুটা শুনেছি। তবে তারা তুমি যেসব কথা বলেছ এগুলো বলে নি। তারা মূলত একাত্তরের ঘটনার জন্য বাঙালিদের এবং ভারতীয় হিন্দুদের দায়ী করে থাকে।

হ্যাঁ, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনার পর ক্রমশ প্রায় সারা বিশ্ব প্রমাণ করেছে যে, ওর জন্যে সবচেয়ে দায়ী কারা ছিল। এবং যে কারণে আজ এই গল্প তোমার কাছে আমি করছি তা বুঝলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে যে সত্যি কোনটি। তো ২৬ মার্চ থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী 'গুট এট সাইট' বা দেখামাত্র গুলি করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে থাকে। সঙ্গে ট্যাংক, মেশিনগান, এবং কামানের ব্যবহার চলতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রচণ্ড ভ্রাস সৃষ্টি করে বাঙালির ক্ষমতায় যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া। তারা একইসঙ্গে মুজিবকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার একটু আগে পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাঙালিরা উপায়ান্তর না দেখে স্বাধীনতাসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে পাকিস্তান মিলিটারি তাদের এই হত্যাकाণ্ড গোপন করার জন্যে সমস্ত বিদেশি সাংবাদিকদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে বের করে দেয়। কিন্তু তুমি তো জানো নিউইয়র্ক মেইল, গ্রোব, নিউইয়র্ক টাইমস, হেরালড ট্রিবিউন এবং অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ প্রেস কী অসাধারণ দক্ষ। বহিষ্কার হয়ে আসার সময়ও তারা এমন সব রিপোর্ট ও ফটোগ্রাফ গোপনে সঙ্গে করে নিয়ে আসে যা থেকে সারা বিশ্ব পাকিস্তানিদের বর্বরতা সম্পর্কে জানতে পারে। আসলে আমিও খবরগুলো ওভাবেই পাই। কারণ মিলিটারি পূর্ব পাকিস্তানে তো বটেই এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানেও এসব খবর গোপন রাখবার চেষ্টা করেছে।



আচ্ছা বাবা, তোমার এই গল্পে আমার প্রসঙ্গটা কীভাবে এবং কোথায় এল তা কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না।

হ্যাঁ, পেনরোজ, এই ভূমিকাটুকু না করলে চট করে তোমার বিষয়টা বলতে পারতাম না। বোঝানোও যেত না। আমি এখন খুব শিগগিরই ওই বিষয়টাতে আসছি যা অত্যন্ত বেদনার এবং অমানবিক।

এর মধ্যে এলেনা তিনজনের জন্যে ধুমায়িত কফির কাপ নিয়ে ক্রমে চুকেছেন। ওডারম্যান আবার বলা শুরু করলেন, একে তো পশ্চিম পাকিস্তানে এবং তারপর একপ্রান্তে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি আমরা প্রথম তিন-চার মাস জানতাম না। আস্তে আস্তে এএফপি ও রয়টার থেকে শুনতে পেলাম যে সরকার পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিদিনই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেওয়া সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করছে। তারা মানুষ তো মারছেই সেইসঙ্গে ওখানকার মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক সন্দেহে নারীদের মোলেস্ট করছে। মাই সান, ইউ নো হোয়াট আই মিন?

পেনরোজ এ সময় অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

যা হোক, পূর্ব পাকিস্তানে আমার কখনো যাওয়া হয় নি। এভাবে একদিন শুনলাম এই স্টকহোম শহরেও প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে অনেক বিদেশি, পাকিস্তানি সেনাদের এই নির্যাতন বন্ধের এবং পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্যে হাজার হাজার মানুষ মিছিল-মিটিং করছে। আমার ডিউটি স্টেশন থেকে একটু পূর্বে নতুন দিল্লি শহরেও একই অবস্থা। এ ছাড়া লন্ডন, ওয়াশিংটন, পশ্চিম জার্মানি এবং বিশ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেশে ও শহরে একই ধরনের সমাবেশের খবর সেলরশিপ দিয়েও পাকিস্তান গোপন করতে পারছিল না। এর মধ্যে আবার পূর্ব পাকিস্তানের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে তখন বাঙালি রিফিউজিদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় এক কোটি। এভাবে একদিন ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাদের হেডকোয়ার্টার জানাল যে, অফিস বন্ধ করে ফেলতে হবে। কারণ পূর্ব পাকিস্তান ইস্যু নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ নাকি আসন্ন। ঠিক তাই। ডিসেম্বরের তিন তারিখে প্রায় আমার এলাকার কাছেই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। ওই যে ম্যাপে দেখো। এলাকাটা কাশ্মীর সীমান্তের একটু দক্ষিণে এবং ভানে অবস্থিত। তেরো

দিন পর ১৬ ডিসেম্বর শুনতে পেলাম, পাকিস্তান তার দুই সীমান্তে ইন্ডিয়ান বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। পূর্ব পাকিস্তান, 'বাংলাদেশ' নাম নিয়ে একটি স্বাধীন দেশে পরিণত হয়েছে। এর পরপরই ওখানকার মানুষ খুন, সম্পদ ধ্বংস এবং নারীনির্যাতনের বীভৎস্য বর্ণনা খোলাখুলিভাবে বিশ্বের সংবাদমাধ্যমগুলোতে আসা শুরু করল। এবং তখন এই খবরের পাশাপাশি একটি খবর আমাদের দারুণভাবে চমকে দিল। তা হলো, পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন সেনাক্যাম্প রেডক্রস নাকি মোট দু'লাখ যুদ্ধশিশুর হিসাব তৈরি করেছে। একে আমরা রোমান ক্যাথলিক এবং তার পর তখন এলেনা এবং আমার বিয়ের বয়স হয়েছে এগারো বছর। আমাদের কোনো সন্তান নেই। রেডক্রস বিজ্ঞাপন দিয়ে জানান দিচ্ছিল যে, এইসব শিশুকে দত্তক হিসেবে নেওয়ার জন্যে বিশ্বের হৃদয়বান মানুষদের আহ্বান জানানো হচ্ছে এবং এর জন্যে ইচ্ছুক মানুষদের যে-কোনোরকম সাহায্য-সহযোগিতা করা হবে। মানবতার এই দুর্গতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মানুষ আর দেখে নি। তারা আরও জানায় যে এই সহযোগিতা না পাওয়া গেলে এইসব অনাথ ও নিষ্পাপ শিশুদের বাঁচানো হয়তো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

চশমা খুলে ওডারম্যান তাঁর চোখ মুছলেন। এলেনার একই অবস্থা। পেনরোজ তার দু'চোখ দু'হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে। ওডারম্যান আবার আরম্ভ করলেন।

এলেনা আর আমি খবরটা শুনে ইস্ট পাকিস্তানে ছুটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। রেডক্রসের প্লেনে করে তখন ওখানে যাওয়া খুব সহজ কাজ ছিল—তারমধ্যে ঢাকায় সেইভিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা)-তে তখন কাজ করছেন আমার বড়ভাই, মানে তোমার নেভার আঙ্কেল।

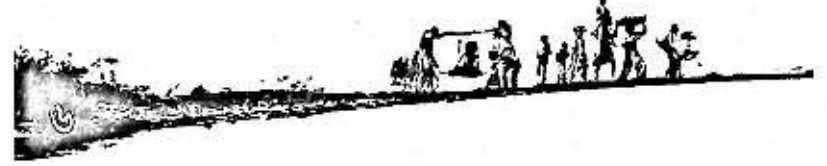
ওডারম্যান তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না। চোখের পানি মুছতে মুছতে পেনরোজ বলল, বাবা, আমি প্রাপ্তবয়স্ক। আমি সবকিছু বুঝতে পেরেছি। তোমার আর কিছু বলতে হবে না।

ওডারম্যান এবার নিজের সোফা থেকে উঠে গিয়ে পেনরোজের পাশে বসলেন। তারপর বললেন, নিশ্চয়ই তুমি একটা বিষয়ে একমত হবে যে তোমার বিষয়ে আমরা আইনত বা নীতিগত কোনো অনায়াস করি নি। রেডক্রসের আইন মেনে ডকুমেন্টস তৈরি করে তোমার দায়িত্ব...।

বাবা, এ বিশ্বে যাদের প্রতি আমার সবচেয়ে কৃতজ্ঞ হওয়ার কথা, হওয়া উচিত, তারাই কিনা আমাকে দিবে কৈফিয়ত? না বাবা, আমাকে আর ছোট্ট কোরো না। নাম-পোত্র-পরিচয়হীন এই আমার স্থান হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশের কোনো-এক অঞ্চলটির পাশের বস্তিতে। তার বদলে আমি কী জীবন পেয়েছি তা কি বিশ্বের কারও কাছে ব্যাখ্যা করে বলবার অবকাশ আছে? যে আনন্দ আমাদের থেকে পেয়েছি তা-ই আমার জীবনের একমাত্র সত্যি। অন্যকিছু নয়।

তার আগেই এটা নিয়ে উভয়ের কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এ সমাজে প্রায় কোনো বাবা-মাই তাদের ছেলেমেয়ের কোনো ব্যাপারে নাক গলায় না। তবে আমরা যেমন অনেক কিছুতেই একেবারে অন্যরকম। তেমনি আমরা ধর্মের সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিই নি। কোনো কোনো বিষয় আমরা বদলাতে পারবও না। এবার আজকের মতো আমরা ঘুমতে যেতে পারি, যদিও কারোই ঘুম আসবে বলে মনে হয় না। সে যা হোক, ঘুম আজ নয় আগামীকাল হবে। তুমি এ নিয়ে কী ভাবলে, কিছু করতে চাও কি না তা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করলে খুশি হব। তুমি আমাদের কী এবং কতটা, তা আমরা জানি। আমি এবং এলেনা তোমার কী এবং কতটা তা হয়তো পঁচিশ বছর ধরে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কাজেই আগের মতোই তোমার যে-কোনো অনুভূতি, যদি মনে করো আমাদের জানাতে চাও তা জানাবে। শুভরাত্রি পেনরোজ।

শুভরাত্রি বাবা এবং মা।



‘দুঃখের শত বরষাতে
বলেছ যে আমি আছি সাথে’

এমনিতে পেনরোজ ভালো ঘুমায়। তবু এলেনার আশঙ্কা ছিল আজ রাতে ও কি ঘুমের ওষুধ-টবুথ খেয়ে ফেলে কি না! এমন একটা ভয়ানক সত্যি নিজের জীবনে মেনে নেওয়া সোজা কথা নয়। আর্থ জাতির মানুষ হলেই বা কী! এলেনা এবং ওডারম্যানও এই বয়সেও মোটামুটি ভালো ঘুমান। কিন্তু আজ তাদের বিন্দ্র রজনী পার হলো। সকালে উঠে এলেনা ছেলের রুমের দরজায় নক করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেনরোজ দরজা খুলে দিল। তিনি ওর চোখ দেখে বুঝলেন রাত ওর কীভাবে পার হয়েছে। আশ্তে করে বললেন, নাশতা খেতে আসবে কি না।

গত রাতে কমে ঢুকে পেনরোজের প্রথমেই যাকে ফোন করার কথা মনে হয়েছিল সে হলো প্রোসারপিনা। মেয়েটি ওর ফিয়াসি। কিন্তু রাত তখন গভীর। প্রোসারপিনা এই শহরেই নসবোটেন স্ট্রিটের বাড়িতে ওর বাবা-মার সঙ্গে থাকে। কাছেই যে সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে সেখানে ও লেকচারার। ওদের বন্ধুত্ব চার বছরের পুরোনো। সকালের নাশতার পর পেনরোজের প্রথমেই মনে হলো এই বান্ধবীর কথা। ফোন প্রায় করতে যাচ্ছিল। তারপর তা আর করল না। কারও জীবনে অনেক তথ্যই আসে যায়। সেগুলো এডিট করা যায়। করার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু কাল রাতে ও যা শুনেছে তা যে এডিট করার কোনো উপায় নেই। তবুও ও ভাবল আর একটু চিন্তা করবে। কী বলবে তা না হয় গেল। কীভাবে বলবে তাও তো একটা কথা।

সারা দিন পেনরোজ কোথাও বের হলো না। বাগান পরিষ্কার, ঘর আর টয়লেট পরিষ্কারে বাবা-মাকে অন্যান্য বন্ধের দিনের মতোই সাহায্য করল। কাপড় ইস্ত্রি করল। ট্রিডমিলে আধঘণ্টা ব্যায়াম করল। এর মধ্যে কয়েকটা ফোন এল। বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছ থেকে।

পাশ্চাত্যে মানুষ হওয়া কোনো মানুষ অতীত নিয়ে না ভাবার ট্রেনিং সব সময় অনুসরণ করে থাকে। পাঞ্জাবের মানুষও পরাজয়, গ্লানি কিংবা অতীত নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবে না। এসবকে অগ্রাহ্য করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার স্পৃহাই তার

বেশি। গতরাতে ঘুম আসে নি। এখন শরীর তার ক্ষতিপূরণ চাইছে। তাই পেনরোজ একসময় ঘুমিয়ে পড়ল নিজের অজান্তে। বেলা দুটোয় ওর ঘুম ভাঙল। লাঞ্চার সময় পার হয়ে যাচ্ছিল। এলেনা একবার ডেকে গেছেন। এবার রুমে ঢুকে তিনি পুত্রের সঙ্গে কিছু কথা বললেন। কৌশলে বুঝে নিলেন, ছেলের শরীর ভালোই আছে। লাঞ্চার শেষ করে পেনরোজ গান শুনতে বসল। আজ সন্ধ্যায় শহরতলীর সিটি কাউন্সিল হলে দর্শনীর বিনিময়ে একটা কনসার্ট আছে। ওটা শুনতে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু এখন বুঝল—না, ওটায় যাওয়ার মন নেই।

পরের তিন দিন ও অফিসে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করল। বিদেশে সুইডিশ সাহায্যপ্রাপ্ত প্রোগ্রামগুলিতে রিহাবিলিটেশন জাতীয় কাজকর্ম দেখা ওর দায়িত্ব। যুদ্ধ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, দাঙ্গা এবং উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়ার ফলে যেসব মানুষ তাদের বসতি এবং শেখড় হারায় তাদের কল্যাণ করাই ওর অফিসের কাজ। এই দুদিন অফিসের কাজ করতে করতে ওর মনে হলো, আমি মানুষের পুনর্বাসনের জন্য কাজ করি। অথচ কী আশ্চর্য, কোনোদিন জানতাম না যে আমি নিজেই একজন পুনর্বাসিত ব্যক্তি। এর মধ্যে প্রোসারপিনা দুবার ওকে ফোন করেছে। ও উত্তর দেয় নি। আজ ও জানাল যে মেলারেন পার্কে অফিস শেষে পেনরোজের সঙ্গে দেখা করবে। বিকেলে দুজনার দেখা হলো। পেনরোজ প্রকৃতিকে বরাবরই ভালোবেসে এসেছে। ওক, পাইন, বার্চ আর বুগেনভেলিয়া দিয়ে শিল্পীর আঁকা নিখুঁত সবুজ রঙের প্রাকৃতিক গোটেনবার্গ, উপসালা, ওল্যান্ড এবং গোটল্যান্ডে একা কিংবা প্রোসারপিনাকে সঙ্গে নিয়ে কত দিন ও ঘুরে বেড়িয়েছে।

এদেশে শীতকালেও ন্যাড়া প্রকৃতিতে আরেকরকম সৌন্দর্য আছে। বরফ, তুষার, ঠান্ডা বাতাস, তার মধ্য দিয়ে চেরি, শিলি আর ডালিয়া ফুলের সমারোহ প্রায় সারা শহরেই। তার মধ্যে এই সেই মাঠ যেখানে পেনরোজ গত অনেক বছর ধরে তার একটা প্রিয় কাজ প্রায় প্রতি বছর দিনেই করে এসেছে। তা হলো বাবা, মা এবং মাঝে মাঝে প্রোসারপিনাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুড়ি উড়ানোতে মেতে ওঠা। লাল রঙের বাজঘড়ি, সবুজ রঙের ফড়িং ঘুড়ি আর রকেটমার্কী সাদা ঘুড়ি ওড়ানোর কাজে ও ওস্তাদ। অনেকের ঈর্ষার পাত্র। কারণ যে-কোনো আবহাওয়ায় ও আকাশের অনেক উপরে ঘুড়ি উড়িয়ে দিতে পারে। মাঠের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, টিলা পাহাড় দিয়ে দৌড়ে নাটাই টানার সূতো কখনো ছেড়ে, কখনো টেনে ধরে ও যে কী এক আনন্দ পায় তা বলার মতো না। একবার ফিনল্যান্ডের এক প্রতিযোগিতায় পেনরোজ একটা সিলভার কাপ জিতে নিয়ে এসেছিল। আজও এই মাঠে অনেক মানুষ ঘুড়ি উড়াচ্ছে। তাতে নানা শব্দ, হইচই। কিন্তু আজ পেনরোজের এসবের কোনো কিছুই দিকেই মন ছিল না। প্রোসারপিনা বলল, কী ব্যাপার? দুদিন ধরে ফোন করছ না, এক সপ্তাহ ধরে নেই দেখা—দেখতেও তোমাকে কেন যেন অন্যমনস্ক লাগছে। কী হয়েছে তোমরা বলো তো?

পেনরোজ বলল, শরীর ভালোই আছে। তবে...। ওর গলাটা যেন বেশ হতাশ শোনায়।

খামলে কেন?

জানো প্রোসারপিনা, আমার জীবনে এক চরম মুহূর্ত এসেছে। আমার এবারের জন্মবার্ষিকীর পার্টির কেক—এর বাণীটা কি ছিল, জানো?

না। কী রকম? শুনি তো।

যে অতীত আমার বাবা-মা অনেক সাবধানে আমার কাছ থেকে দীর্ঘদিন গোপন রেখেছিলেন আজ তা প্রকাশিত। তাঁরা আমাকে যা বলেছেন তা এক চরম গ্লানি। এক মসীলিষ্ঠ পরম অপমান জড়িয়ে রয়েছে আমার নিষ্ঠুর অতীতে। তা অতি লজ্জার। সে বৃত্তান্ত ব্যক্ত করতে আমার লজ্জা আর দুঃখ হচ্ছে। গত কদিন আমি তাই আপন মনে একাকী পুড়ে মরেছি।



‘এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুঃখে দুঃখী
আকাশে জল ঝরে অনিবার।’

পেনরোজ বলে চলে।

প্রোসারপিনা নিঃশব্দে গুনতে থাকল। পেনরোজ শেষে বলল, আমার মনে হচ্ছে আমার জীবনের ভিত বিশ্বাস এবং স্বপ্ন সবই মিথ্যে হয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম পৃথিবীতে আমার কেউ ছিল না। তবু তুমি ছিলে। এখন নিশ্চয়ই তাও মিথ্যে হয়ে যাবে। জেনে-গুনে এমন একজন মানুষকে তোমার মতো রোমান ক্যাথলিক কি আর গ্রহণ করবে? যেখানেই বড় হয়ে থাকি না কেন আমার জীবনের বৈশিষ্ট্য আসলে এশিয়ান। এবং সেজন্যই আমার মনে হচ্ছে আত্মহত্যা করাই আমার একমাত্র পথ।

প্রোসারপিনা বুঝতে পারল—এ তো এক ঘোর বিপদের আশঙ্ক দেখতে পাচ্ছি। এর তাপ আর চাপ থেকে এই ভালো মানুষটিকে রক্ষা করতে হবে। এ পথে একে একা ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না। ও বলল, অনেক অপ্রত্যাশিত, নাটকীয় অথচ সম্পূর্ণ সত্যি এতগুলো কথার মধ্যে যেগুলো কিনা আবার সবই একান্ত নেগেটিভ, তুমি একটা ইতিবাচক কথা বলেছ।

মরণনুখ একজন মানুষের কথার মধ্যে তুমি আবার ইতিবাচক কোন জিনিসটা আবিষ্কার করলে?

তা হলো এই যে তোমার এশিয়ান বৈশিষ্ট্যের কথা।

কী রকম?

রকম হলো এই যে, আমাদের এই সমাজে এটা কোনো সমস্যাই নয়। এদেশে দু-এক শ’ নয়, অসংখ্য মানুষের কোনো জন্মপরিচয় নেই। লাখ লাখ দম্পতি কখনো বিয়ে করে নি, কিন্তু দিব্যি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সংসার করছে। যে এশিয়ান সচিবের কথা তুমি বলছ সেটা আমাদের সমাজে কোনো ব্যাপার নয়। আমিও এগুলোয় কেয়ার করি না। কে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে তার জন্য সে দায়ী নয়।

কাজেই আমি তোমার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। সম্পর্কও আমাদের আগের মতোই অটুট থাকবে। দেখো আমি যদিও আর্টসের ছাত্রী নই তবু পশ্চিমের সমাজের উচ্চারিত মানববিদ্যার অনেক কথাই বিশ্বাস করি। তা হলো—

‘Count your age by friends, not years,
Measure your life by smiles, not tears.’

সোশ্যালজির ছাত্র হিসেবে কত এথনিক গ্রুপের পরিচিতি সংকটের কথা পড়েছি এবং দেখেছি। অথচ আমি তো এমনকি মাইনোরিটিও নই। জানো আমার জীবনের এই বৃত্তান্ত শুনে প্রথম কয়েক মুহূর্ত আমার মনে হয়েছিল আচমকা ধ্যে আসা এক সমুদ্রের জোয়ার আমাকে যেন অতলান্তে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যদিও বাবা-মা খুব সাবধানে, অনেক ভূমিকা করে কথাগুলি আমাকে বলেছেন। তাও মনে হচ্ছিল আমি এক বিষপুত্র।

তাই তো বলি ক’দিন ধরে তোমাকে অন্যরকম মনে হয়েছে। আজ কারণটা বুঝলাম।

যাক। তোমার কথায় কী যে ভালো লাগছে তা বলতে পারব না, কোনোভাবেই বোঝাতে পারব না।

আমরা, মানে নারী জাতি, কিন্তু অত্যন্ত আশাবাদী—পুরুষের তুলনায়। নইলে কি নারীরা বাচ্চা জন্ম দিতে পারত? কাজেই আমি বিশ্বাস করি পথ একটা হয়েই যায়। আত্মহননের চিন্তা মাথার মধ্যেও আনবে না। এটা একটা পরাজয়। আমি আর যা-ই হোক হতাশায় ভুগতে রাজি নই। কারণ জীবন মাত্র একটা এবং তা একবার। কখনোই আবার জন্ম নেব না। অতএব এনজয় করতে হবে এটাকে।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই একটা তথ্যেই জীবনের সব আলো যেন নিভে গেছে। এই আঘাত আমি ভুলব কী করে?

ভুলতে হবে না। মাথার আরেক কোণে রাখতে হবে। দেখো না কম্পিউটারে কত কিছু আমরা হাইড করে রাখি। সব কি একইসঙ্গে জিনে দেখা যায়? তার প্রয়োজনও তো হয় না। তবে কিছু মনে না করলে তোমার একটা দোষের কথা বলব।

বলো।

সেটা হলো—আগেও দেখেছি, অতীত তুমি ম্যানেজ করতে পারো না এবং এটা এশীয়দের বৈশিষ্ট্য।

আমি যে আসলেই এশিয়ান।

হোক, তা ম্যানেজ করতে হবে। এবং তা সম্ভব। আর সম্পূর্ণ এশিয়ান বৈশিষ্ট্যই বা সব সময় কী করে বলি? তোমার মার বাড়ির কথা যা বললে সেখানকারই ভাষা বলতেন এক এশীয় কবি। দেখো তো তার কী চমৎকার আশাবাদ!

কী নাম তার ?

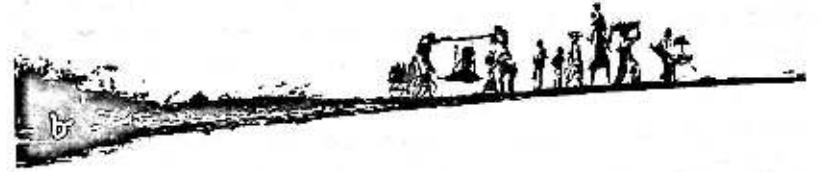
কেন ? ট্যাগোর। তাঁর কবিতার ইংরেজি এবং সুইডিশ অনুবাদ আমি এক জায়গায় পড়েছি। তাতে তিনি এ ধরনের কিছু কথা বলেছেন। কাজেই সব মানুষের কি বংশপরিচয় লিখে রেখে যেতে হবে এই পৃথিবীতে ? তাছাড়া পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে মানুষের মধ্যে বিয়ে হতো কোন বিধান মতে বলো তো ?

হ্যাঁ, এগুলোর উত্তর নেই।

কাজেই নৈতিক-অনৈতিক হওয়ার বিষয়টা তথ্য পাওয়া বা না-পাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। চূড়ান্ত কোনো সত্য নয়। আর জীবনে ভালো থাকা, আনন্দে থাকাটাই সব। সে চেষ্টা করতে হবে।

প্রোসারপিনা, তুমি এত সহজে আমার জীবনের সব ক্ষুদ্রতা আর অন্ধকারকে এক ফুৎকারে সরিয়ে দিতে পারলে ?

হ্যাঁ, পারলাম। কারণ জীবনের সবকিছু অবিশিষ্ট নয় এবং নিরবচ্ছিন্নও নয়।



তাহলে আমি এখন কী করব ?

আমার মনে হয় প্রথমত, তোমার বায়োলজিক্যাল মার খোঁজখবর করতে পারো। এসব ঘটনায় নারীর দোষ প্রায়ই থাকে না। হয়তো পরিবেশের চরম প্রতিকূলতার জন্যে তিনি তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তারপরও একজন নারী তাঁর সন্তানকে কখনোই ভুলে যেতে পারেন না। মাত্র পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। অতএব তাঁর বয়স এখন বেশি হলে হয়তো চুয়াল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ হবে। তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। তোমার জীবনে এটি হচ্ছে তোমার প্রথম কর্তব্য। এবং আমি বলব, একমাত্র চ্যালেঞ্জ।

এই কথাটি আমারও মনে হয়েছিল, বাবা-মার কাছ থেকে উনিশ শ' একাত্তর সালের সব ঘটনা শোনার পর। কিন্তু তুমি এই কথাটি কী করে বুঝতে পারলে ?

পারলাম এইজন্য যে, যে-কোনো ছেলের মনে এটা কাজ করবেই।

ঠিক আছে। তবে তার আগে আমি আরেকটি কাজ করব। তা হলো ওই দুর্বৃত্ত এবং আমার তথাকথিত পিতার মুখটা একবার দেখতে চাই।

এটা কিন্তু তোমার ছেলেমানুষি। আর তুমি এটা করবে কী করে ? ওখানে যাওয়া বেশ কঠিন হতে পারে বলে আমার মনে হয়। কারণ বিশ্বের নানারকম সংস্থা এদের বিষয়ে ওই চেষ্টা করেছে, সফল হয় নি।

আমার জীবনের কথা ভুলে যেনো না। যারা চেষ্টা করেছে আমি তাদের মতো নই। আমি সফল হব।

ধরো লোকটি বেঁচে আছে। তাঁকে খুঁজেও পাওয়া গেল, তারপর ? তাতে তোমার লাভ কী হবে ?

লাভ হবে এই যে, আমার জ্ঞানামতে বিশ্বের এমন একটি জীব আমি এই প্রথম দেখব। এই বিষয়টার মানব সভ্যতার সঙ্গে এবং পৃথিবীর অসংখ্য উদাহরণের সঙ্গে পার্থক্য কী তা কি চিন্তা করে দেখেছ একবার ? এই পৃথিবীতে কয়েক কোটি দম্পতি আছেন, যারা একটি সন্তান পাওয়ার আশায় জীবনের সর্বস্ব পণ এবং ত্যাগ করেছেন। তারপরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা তাতে সফল হন নি। উন্নত বিশ্বে একটি টেস্টটিউব বেবির জন্যে অনেক দম্পতি ঘরবাড়ি বিক্রি করেছেন। এবং

তারপরও শিশুটির জন্ম হয় নি। দূর থেকে সন্তানের কোনো দুঃসংবাদ শুনে এবং তা যাচাই না করেই এ বিশ্বের অনেক পিতা বা মাতা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মুহূর্তে মারা গেছেন। আর এই দুঃসংবাদগুলির ধরন এমন ছিল না যে, ওই সন্তানটির কোনো কারণে মৃত্যু হয়েছে। বরং খবরগুলি ছিল এরকম যে, কন্যার ডিভোর্স হয়েছে কিংবা পুত্র সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে কোনো হাসপাতালে স্থান লাভ করেছে। অসংখ্য সংবাদপত্রে, টেলিভিশনে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা এই বিষয়গুলো জেনেছি। এবং এই ঘটনার হেরফের সবচেয়ে উন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে সবচেয়ে অনুন্নত আফ্রিকার বুরুন্ডিতেও ঘটে নি। মানুষের সন্তান-আকাক্ষা হচ্ছে এমনি তীব্র। তাহলে এগুলির সঙ্গে তুলনাক্রমে এই মানুষ নামধারী খুনি এবং অসভ্য প্রাণীদের নিষ্ঠুরতা কতখানি গভীর তা ভেবে কূল পাওয়ার মতো নয়। দুই লাখ শিশুকে পরিত্যাগ করে তারা কী করে চলে আসতে পারল ?

তোমার কথাগুলো গভীর এবং অনস্বীকার্যভাবে সত্যি। তবে বিভিন্ন যুদ্ধের সময় সারা বিশ্বেই এগুলি ঘটেছে।

সারা বিশ্বের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। আমার সম্পর্ক শুধু ১৯৭১-এর পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে।

কিন্তু তুমি ঠিক ওই মানুষটির নাম কীভাবে জানতে পারবে ?

পারব না। পেরেছি। বাবা আমাকে তা বলেছেন। আমাকে এডোপট করার সময় তিনি এই বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন। আমি তার বিস্তারিত বিবরণ দিলেই তুমি বুঝবে এই তথ্যটি নির্ভরযোগ্য। আর বাবাকে তো আমি তেইশ বছর যাবৎ দেখছি। যে কাজে তিনি হাত দেন তাতে তিনি একজন পারফেকশনিস্ট।

তাহলে এখন তুমি কী করতে চাও ? পাকিস্তান যাওয়ার পাগলামো যদি একান্তই বাদ না দিতে চাও।

দেখো, বাংলাদেশে যেতে হলে পাকিস্তানের ওপর দিয়েই যেতে হবে। কাজেই ওখানের জন্য আলাদা পরিশ্রম বা অর্থ ব্যয় তেমন একটা হবে না।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু কী উদ্দেশ্যের কথা বলে তুমি ওখানে ঢুকবে ? আর ওই ঠিকানা এবং লোককে, একজন বিদেশি হয়ে, ওখানকার ভাষা না জেনে, বের করা ঝুঁকিপূর্ণ হবে। এমনকি এতে একপর্যায়ে ওখানকার কর্তৃপক্ষের বা পুলিশের সন্দেহেরও উদ্ভেক করতে পারে।

কেন ? ট্যুরিস্ট হিসেবে ঢুকব। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই একই উদ্দেশ্যে দেশটার নানা স্থানে ঢুকছে। আর কোনো-একটা বড় বিমানবন্দর দিয়ে ঢোকার পর ওদের সেলোয়ার কুর্তা পরে আমি যে-কোনো শহর বা গ্রামে ঢুকে যেতে পারব। আর ভাষা ? একজন গাইড নিয়ে নিব।

কিন্তু গাইড একেবারে সেই ঠিকানায় নিয়ে যাবে, অথচ সন্দেহ করবে না বা ওই ঠিকানার কথাটা কোনো কর্তৃপক্ষকে বলে দিবে না, তার নিশ্চয়তা কী ?

ও দেশটা যে কী তা কি পেপারে পড়ো না ? টেলিভিশনে দেখো না ? ও নিয়ে ভেবো না। ওখানে আমি ঠিকমতোই ঢুকে পড়তে পারব। এখন বলো, তুমি এসবে আমার সঙ্গে আছ তো ?

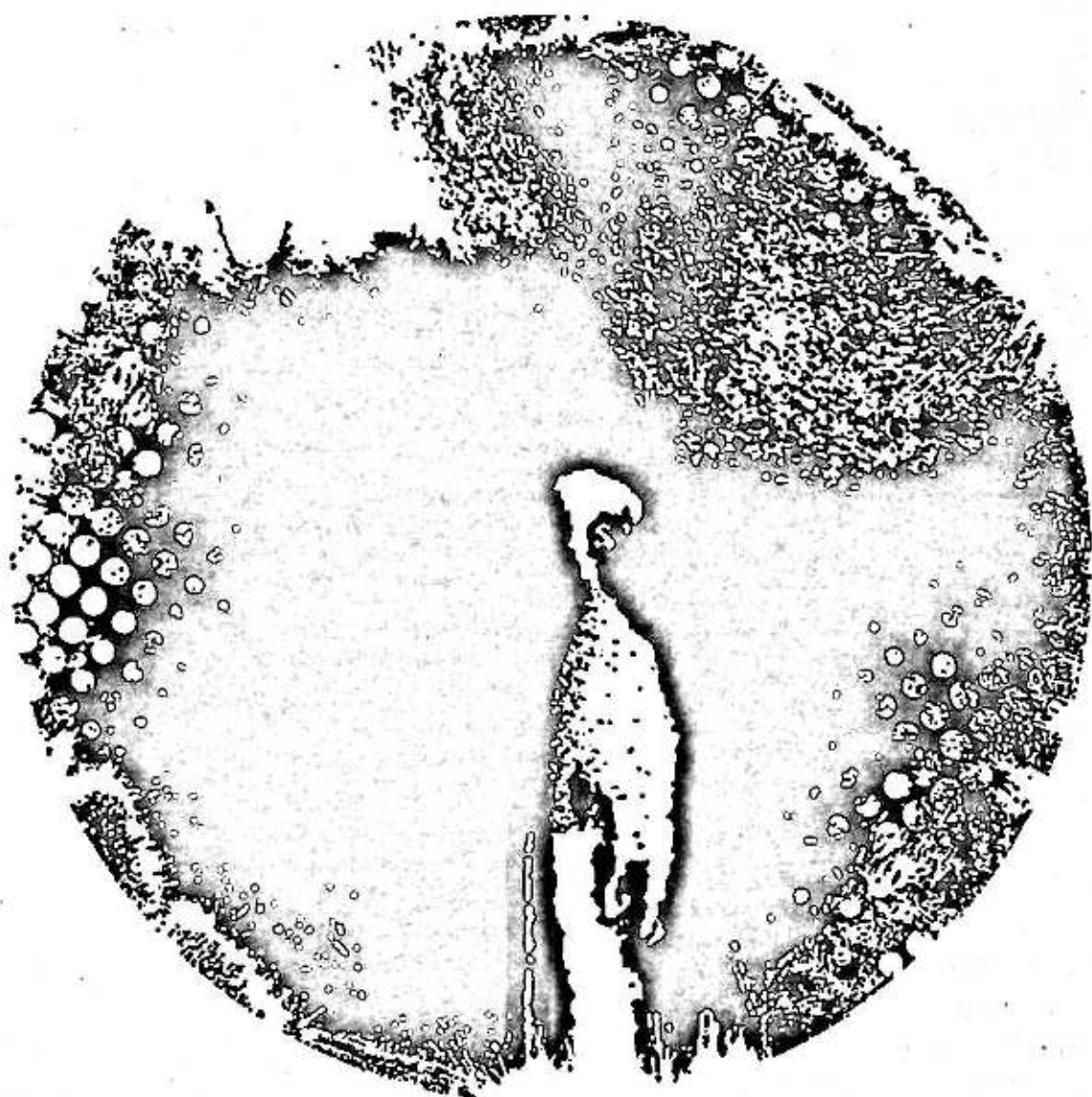
বলেছি তো আছি।

জন্মদিনের পার্টি শেষে এই কথাটি শোনার পর থেকে নিজেকে যে কীরকম বেশি একা বলে অনুভব করেছিলাম তা তোমাকে বলে বুঝাতে পারব না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বাড়িবাদল অনেকটাই কমে গেছে এবং এই ভয়ংকর ঘটনার পরও আমি নিঃসঙ্গ নই। যাক, তুমি আমার সঙ্গে থাকছ।



রৌদ্রবেলা ও ঝরাফুল

মাসুদ আহমেদ



অন্যপ্রকাশ

গ্রন্থকৃত্ত শেখক

দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০১৭

প্রথম প্রকাশ : ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬

লেখক এবং প্রকাশকের দ্বিধিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা এতিনিশি করা যাবে না। কোনো ব্যক্তিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন কম্পিউটার, টেপ বা পুনরুৎপাদনের সুযোগ সংবলিত ডাট্য সঙ্কলন করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে এতিনিশি করা যাবে না। বা কোনো ডিক, টেপ, প্যারামেট্রি মিডিয়া বা কোনো অথ্য সংরক্ষণের ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : মাজহারুল ইসলাম, অন্যপ্রকাশ

৩৮/২-ক বাহালাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৫৭১৬৪১২৪

প্রচ্ছদ : ফ্রব এবং

মুদ্রণ : কালারলাইন প্রিন্টার্স

৬৯/এফ খানরোড, পাছপথ, ঢাকা

মূল্য : ২৫০ টাকা (১২ মার্কিন ডলার)

Rodrabel O Jhoraful

by Masud Ahmed

Published in Bangladesh

by Mazharul Islam, Anyaprokash

e-mail : anyaprokash38@gmail.com

web : www.e-anyaprokash.com

ISBN : 978 984 502 343 6

বিশ্বজোড়া ছড়িয়ে থাকা
সেইসব মহানুভব দম্পতিকে,
যারা ১৯৭১-এর যুদ্ধশিশুদের
স্থান দিয়েছিলেন
তাদের স্নেহভরা কোলে।

জুজু
(সেইসব বীল, পৃষ্ঠা ২০)

স্বাক্ষর
২৫.৪.২০১৭
(মাসুদ আহমদ)

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক

দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০১৭

প্রথম প্রকাশ : ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬

লেখক এবং প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিস, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুৎপাদনের সুযোগ সংবলিত তথ্য সংগ্রহ করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : মাজহারুল ইসলাম, অন্যপ্রকাশ

৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৫৭১৬৪১২৪

গ্রন্থদ : প্রব এন্ড

মুদ্রণ : কালারলাইন প্রিন্টার্স

৬৯/এফ গ্রীনরোড, পাটুপা, ঢাকা

মূল্য : ২৫০ টাকা (১২ মার্কিন ডলার)

Rodrabel O Jhoraful

by Masud Ahmed

Published in Bangladesh

by Mazharul Islam, Anyaprokash

e-mail : anyaprokash38@gmail.com

web : www.e-anyaprokash.com

ISBN : 978 984 502 343 6

বিশ্বজোড়া ছড়িয়ে থাকা
সেইসব মহানুভব দম্পতিকে,
যারা ১৯৭১-এর যুদ্ধশিশুদের
স্থান দিয়েছিলেন
তাদের স্নেহভরা কোলে।

লেখকের অন্যান্য বই

- বিজয় নীল জলে (২০১৫)
বিশ্বতীর্থ (২০১৩)
চৈত্রপদন ও দিগন্তরেখা (২০০৭)
ভাইফোঁটা (২০১৩)
কোথায় পাবো তাকে (২০১১)
মেঘ আছে জল নেই (২০০৬)
স্বপ্নযাত্রা (২০১৩)
চাঁদ যখন উঠলো (২০১০)
অন্যজন (২০০৯)
ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া (২০১২)
বুজির নীলিমা (২০১২)
আসিনায় জোছনাতে (২০০৮)
লেডি টিচার দিচ্ছি/নিচ্ছি (২০১১)
শিল্পী (২০০৬)
নীল শালুকের ঝিলে (২০০৮)
গৌরী ও একুশ জিহ্বী উত্তর অক্ষাংশ (২০০৭)
আহির ভায়রো (২০০৫)
শামা (২০০৯)
নীতিশিক্ষা শিশু এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ (২০০৯)
সীমন্তিনী ও অশ্রু (২০১৫)
পৃথী (২০১৬)
Dusk, Dawn And Liberation (2013)
মেঘলা দুপুর (২০১৭)

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের মুদ্রাশিল্পীদের নিয়ে কিছু গবেষণামূলক কাজ হয়েছে—ইংরেজি ও বাংলায়। কিন্তু এ সম্পর্কে লেখা গল্প-উপন্যাসের কথা আমার জানা নেই। মাসুদ আহমেদের *রৌদ্রবেলা* ও *ঝরাফুল* এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য পদক্ষেপ। এই উপন্যাসের পশ্চাদভূমিতে আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বৃহৎ পট, আর সামনে আছে পরবর্তী কোনো সময়ের কয়েকজন ব্যক্তি। মাসুদ আহমেদের লেখায় সমষ্টির অভিজ্ঞতা যেমন সংযতভাবে প্রকাশলাভ করেছে, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে ব্যক্তির মনোলোকের নানা ঘট-প্রতিঘাত। প্রত্যাশিতভাবেই আত্মপরিচয়ের সংকটের একটা বড় দিক, আবার সন্তানকে অপরের হাতে তুলে দেওয়ার পরে মায়ের বেদনাবোধ এবং তাকে আবার খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, তাও উল্লেখযোগ্য রূপ পেয়েছে। ইতিহাস যাদের নিয়ে খেলা করে, তাদের বাস্তব জগৎ ও মনোলোকে কত কী ঘটে, কে তার হিসাব রাখে। লেখকের কল্পনায় তার যে চিত্র ধরা পড়েছে, তা আমাদের ভাবায়। ইতিহাসের গতি রুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই, সম্মিলিত চেষ্টায় আমরা তার গতি বদলে দিতে পারি। ১৯৭১-এ তা-ই হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তির জীবনে তার অমোচনীয় ছাপ অজানিত ও অপ্রত্যাশিত অনেক কিছু ঘটায়। এ বইতে সেই কথা আছে।

মাসুদ আহমেদ দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কথাশিল্পী। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি নবাগত নন। *রৌদ্রবেলা* ও *ঝরাফুল* প্রকাশের উপলক্ষে আমি আবার তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনিসুজ্জামান
৬ নভেম্বর ২০১৬

লেখকের অন্যান্য বই

- বিজয় নীল জলে (২০১৫)
 বিপ্রতীপ (২০১৩)
 চৈত্রপবন ও দিগন্তরেখা (২০০৭)
 ভাইফোঁটা (২০১৩)
 কোথায় পাবো তাকে (২০১১)
 মেঘ আছে জল নেই (২০০৬)
 স্বপ্নযাত্রা (২০১৩)
 চাঁদ যখন উঠলো (২০১০)
 অন্যজন (২০০৯)
 ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া (২০১২)
 বুজির নীলিমা (২০১২)
 অঙ্গিনায় জোছনাতে (২০০৮)
 লেডি টিচার দিচ্ছি/নিচ্ছি (২০১১)
 শিল্পী (২০০৬)
 নীল শালুকের ঝিলে (২০০৮)
 গৌরী ও একুশ ভিত্তি উত্তর অক্ষাংশ (২০০৭)
 আহির ভায়রো (২০০৫)
 শামা (২০০৯)
 নীতিশিক্ষা দিও এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ (২০০৯)
 সীমন্তিনী ও অপ্রেম (২০১৫)
 পৃথি (২০১৬)
 Dusk, Dawn And Liberation (2013)
 মেঘলা দুপুর (২০১৭)

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নিয়ে কিছু গবেষণামূলক কাজ হয়েছে—ইংরেজি ও বাংলায়। কিন্তু এ সম্পর্কে লেখা গল্প-উপন্যাসের কথা আমার জানা নেই। মাসুদ আহমেদের রৌদ্রবেলা ও ঝরাফুল একেত্রে স্বরণযোগ্য পদক্ষেপ। এই উপন্যাসের পশ্চাদভূমিতে আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বৃহৎ পট, আর সামনে আছে পরবর্তী কোনো সময়ের কয়েকজন ব্যক্তি। মাসুদ আহমেদের লেখায় সমষ্টির অভিজ্ঞতা যেমন সংযতভাবে প্রকাশলাভ করেছে, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে ব্যক্তির মনোলোকের নানা ঘাত-প্রতিঘাত। প্রত্যাশিতভাবেই আত্মপরিচয়ের সংকটের একটা বড় দিক, আবার সন্তানকে অপরের হাতে তুলে দেওয়ার পরে মায়ের বেদনারোধ এবং তাকে আবার খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, তাও উল্লেখযোগ্য রূপ পেয়েছে। ইতিহাস খাদের নিম্নে খেলা করে, তাদের বাস্তব জগৎ ও মনোলোকে কত কী ঘটে, কে তার হিসাব রাখে! লেখকের কল্পনায় তার যে চিত্র ধরা পড়েছে, তা আমাদের ভাবায়। ইতিহাসের গতি রুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই, সম্মিলিত চেষ্টায় আমরা তার গতি বদলে দিতে পারি। ১৯৭১-এ তা-ই হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তির জীবনে তার অমোচনীয় ছাপ অজানিত ও অপ্রত্যাশিত অনেক কিছু ঘটায়। এ বইতে সেই কথা আছে।

মাসুদ আহমেদ দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কথাশিল্পী। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি নবাগত নন। রৌদ্রবেলা ও ঝরাফুল প্রকাশের উপলক্ষে আমি আবার তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

বাংলা বিভাগ
 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনিসুজ্জামান
 ৬ নভেম্বর ২০১৬

‘কারো কবিতু, কারো বীরত্ব
কারো অর্থের খ্যাতি,
কেহবা প্রজার সুহৃদ সহায়
কেহবা রাজার অতি।
তুমি আপনার বন্ধু জনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়ী।’

আমার যত দেনা

এটি আমার চব্বিশতম সাহিত্য সৃষ্টি প্রচেষ্টা।

রাজনীতি, গোষ্ঠীস্বার্থ, রণশঙ্কা, রণভংকা, পারস্পরিক হনন, বিজয়ীর উল্লাস, বিজিতের পরাভব-এর বিবর্তনের মধ্যদিয়ে বিশ্বে সীমানা ও স্বার্থের নতুন নতুন বিন্যাস ঘটে। অসন্ত্রম, অগ্নিসংযোগ, ধ্বংস আর নিহত স্বজনের স্মৃতি পেছনে ফেলে মানুষ আবার উঠে দাঁড়ায়, নতুন সৃষ্টি ও নবজীবনের আলোক সভাবনায়। তারপর এইসব কুশীলবকে নিয়ে আলোচনা করতে থাকে ইতিহাস। এর শিল্পরূপ নিয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে সাহিত্য, সংগীত এবং চিত্রকলা। তাতে স্থান পায় রাজনীতিবিদ, সেনাপতি, সৈন্য, সাধারণ মানুষ, আমলা, ‘লাঙল কাঁধে কৃষক’, ছাত্র, শ্রমিক এবং আরও নানা শ্রেণির মানুষ। কিন্তু সেখানে অপাঙ্কতের হয়ে থাকে একদল নিরপরাধ ‘অপরাধী’ মানুষ। অথচ তরা নিষ্পাপ। যুদ্ধের ফল—যুদ্ধশিশু। যুদ্ধোত্তর ইউরোপেও বড় করে এই সংকট দেখা দিয়েছিল। সসংকোচ, সলজ্জ, আত্মনিমগ্ন, গন্তব্যহীন, গোত্র-পরিচয়হীন এদের জীবন ও জীবিকা নিবিড় তমিস্রাতে ঢেকে রাখে সমাজ। ১৯৭১-এ উদ্ভূত বাংলাদেশের এই জনগোষ্ঠী নিয়ে আলোচনা প্রায় হয় নি বললেই চলে। এই উপন্যাসে দেলজুয়ারা বেগম, পেনরোজ ও ওডারম্যান দম্পতির মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এই মানবিক অধ্যায়কে উন্মোচন করবার চেষ্টা করেছি। তবে তা নিশ্চয় পেরেছি কি না তা পাঠকেরাই বলবেন।

কাহিনির নির্মাণ ও প্রকাশ করার কাজে আন্তরিক সহযোগিতা করার জন্য রিফাত রেজা, ড. সৈয়দা আইরিন জামান, কানাডা প্রবাসী মোস্তফা চৌধুরী, কবি সাহাদ চৌধুরী, নাসির মাহমুদ, মাজহারুল ইসলাম, শাহরিয়ার পিউ, তোফাজ্জল নেয়ামত, খুরশীদ আলম পাটওয়ারী, রেজাউল ইসলাম, গোলাম মুস্তাফা এবং দেশ পত্রিকাকে আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার পাঠক (বই কিনে বা ধার করে), সমালোচক (কিনেন নি তবে পড়েছেন), ফ্রেতা (কিনেছেন কিন্তু পড়ার সময় পান নি) ও সমর্থক (কিনেছেন, পড়েছেন এবং পাশে দাঁড়িয়েছেন) বৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁরাই আমার এই উজান গাঙের নৌকাখানিকে টেনে চলছেন। এই অধিবাসের অন্যতম বাতিঘর, বিতংকতার পরম সাধক, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, পদ্মশ্রী, আমার এই উপন্যাসের মুখবন্ধ লিখে দিয়ে আমাকে অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে নিবদ্ধ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিলে খুব সামান্য কাজ হয়। অসামান্য কিছু বলব সেই সামর্থ্য আমার নেই। অতএব তিনি বুঝে নেবেন।

মাসুদ আহমেদ

৩ নং মিল্টো রোড, ঢাকা